তবু গল্প নয়

শাহ্‌জাহান চঞ্চল

(এক)

আমি গল্প লিখছি আজকাল। তো আমার এক লেখক বন্ধু, গল্পে যার পাকা হাত সুযোগ পেলেই বিনে পয়সায় আমাকে দেয় উপদেশ। গল্প লিখছো ভাল কথা। গল্পের যে একটা কাঠামো আছে– তা নিশ্চয়ই তোমার জানা? গল্প লেখা হেলা -ফেলার বিষয় নেই। এটা তোমাকে মনে-প্রাণে মানতেই হবে। আর গল্পের বর্ণনা! এটা হতে হবে বাসমতি চালের মতো ঝরঝরে। শিল্পের জাফরান জড়াতে হবে শরীরে তার। পরিবেশ আর পরিস্থিতি এগুলো অবশ্যই রাখতে হবে ভাবনায়। তোমার লেখা পড়ে পাঠক যদি টান টান সটান হয়– তবে ধরে নিতে পারো তোমার গল্প কিছুটা হয়েছে।
কিন্তু আমি বোবা – কানা– খঞ্জ। বন্ধুর সেই কথাকে কার্পাস তুলার মতো ফুঁ দিয়ে ভাসিয়ে দেই শূন্যে। অবশ্য তার সামনে নয়। আধুনকি যুগে ভব্যতা, সভ্যতা বলে বিষয়টা তো মেনে চলতে হয়।
তো আমার এই মানসিকতায় লোকসানটা সম্ভবত আমারই হয়। সেটার প্রমাণ পাই কিছুদিন আগে। আমার স্ত্রী ব্যস্ত রান্না ঘরে। আমার ঢাল– তলোয়ার ছেলে– মেয়ে দুটি হাঁসের মতো প্যাক প্যাক করছে মায়ের চারিদিকে।
রান্না ঘর থেকে ভেসে আসে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর।
–এই শুনছো ?
– হ্যাঁ ! বলো. . .
– এই দুইটারে একটু নাও। গল্প–টল্প শোনাও। "আমার কলিজাটারে একেবারে ভাজা করে দিচ্ছে।"
আমি কাছে ডাকি ছেলেমেয়ে দুটিকে আমার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে।
–এই সৌরভ. . . এই স্বপ্নীল। তোমরা আইসো। আমি তোমাদের গল্প শুনিয়ে তোমার মা'কে পরিত্রাণ করিবো।
ঝর্ণার মতো কলকল করে দু'ভাই-বোন দৌঁড়ে আসে। বসে আমার কোল ঘেঁষে। প্রস্তুতি নেয়া গল্প শোনার– হাতের তালুতে চিবুক ঠেকিয়ে। আমি সুযোগ পাই পুরোনো একটি গল্পকে নিরীক্ষাধর্মী (!) করে লেখার প্রচেষ্টাকে গিনিপিগ হিসেবে ওদের ওপরে প্রয়োগ করার।

এক দেশে এক ছিলো রানী। তার ছিলো চার রাজা। বড় রাজা, মেঝ রাজা, সেজো রাজা আর ছোট রাজা। একদিন হল কী .. .. ..। কথাটা শেষ করার আগেই দেখলাম আমার ছেলেটি বোনের হাত ধরে টানছে। রাজ্যর রাগ চোখ–মুখে।
–এই স্বপ্নীল আয়। গল্প শোনা লাগবে না। আব্বু মিথ্যে গল্প বলছে।
আমি দুটোকে শান্ত করার আগেই দৌঁড়ে গিয়ে হাজির মায়ের কাছে।
কি হয়েছে মা ? কি হয়েছে বাবা ? – আমার স্ত্রীকে বলতে শুনলাম ব্যাকুলভাবে। একটু আগেই যে ছেলেমেয়ে দুটো ওর কলিজা ভাজায় রত ছিলো, তা ভুলে গেছে নিমিষেই।
ছেলেটি জোর–শোরেই অভিযোগ করছে শুনলাম।
– আব্বু মিথ্যা গল্প বলছে। এক দেশে নাকি এক রানী ছিলো। তার চার রাজা ছিলো। এটা হয় আম্মু ? এক রানীর কি চার রাজা হয় ?
আমি প্রমাদ গুনলাম। আমার স্ত্রী নির্ঘাত এখন রুটির বেলচা হাতে দাঁড়াবে। থাকলাম নিরিক্ষাধর্মী গল্প বলার শাস্তির অপেক্ষায়।
–তুমি ছেলেপুলেকে কি বলা শুরু করেছো ? পাহাড় সমান রাগ গিয়ে জিজ্ঞেস করে আমার স্ত্রী।
–কেন ? গল্প ! মিন্ মিন্ করে জবাব দেবার চেষ্টা করি আমি।
– রাখ তোমার গাঁজাখুরী গল্প। এক রানীর চার রাজা ছিলো .. .. । ভড়ং। লোকজন তোমার কলম কেড়ে নেবে। তোমাকে পাগলখানায় পাঠাবে। এই তোরা আয় . . . . বলে আমার স্ত্রী রান্না ঘরে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেই আমি বললাম .. .. ..

–কেন .. .. .. এক রানীর চার রাজা থাকতে পারে না কেন? তোমার তো অজানা নয়, পৃথিবীতে কতিপয় উপজাতিতে একজন নারী গ্রহণ করতে পারে কয়েকজন স্বামী। সেই নারী যদি কালক্রমে হয়ে ওঠে রাজ্যের কর্ণধার 'রানী' তো তার স্বামীরা কি হবে .. .. .. প্রজা না রাজা ?
আর পুরাণের দ্রৌপদী'র কথাই ধরো। পাঁচ স্বামী নিয়ে তাঁকে করতে হয়েছে ঘর। পাঁচ পান্ডবের এক স্ত্রী ! দ্রৌপদী। তো দ্রৌপদী যদি কোন কালে রানী হতো, পঞ্চ পান্ডব নিশ্চয়ই.. .. ..
–না। পঞ্চপান্ডব কোনভাবেই রাজা নয়। রাজার স্ত্রীরা রানী হতে পারে। কিন্তু স্বামী কখনোই রাজা নয়। আর এক রানীর কয়েক স্বামী। জনগণ পুড়িয়ে দেবে রানীর সিংহাসন।
আর তুমি যদি এই ধরনের গল্প লেখ আমি ভেঙ্গে দেবো তোমার কলম। কথাগুলো বলে আমার স্ত্রী হেঁটে যায় গট গট করে।
আমার গল্প লেখার ইচ্ছেটা একেবারে মাটি হয়ে আসে। লেখার খাতাটা ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছে জাগে সেই মুহূর্তে।

(দুই)

পৃথিবীটাতো আর নিজের ইচ্ছে মতো চলে না। অন্তরালে আছে চালক কেউ। কাজেই আমি গল্প লেখা বন্ধ করতে চাইলে কি হবে? স্মৃতিতে এসে দাঁড়িয়ে গেল গল্পের পটভূমি। আমার দাদী। তাঁকে নায়িকা বানিয়েই আবার শুরু গল্প তৈরি। গল্পের বর্ণনা হবে উত্তম পুরুষে। আমি জানি এ ব্যাপারেও আমাকে নাস্তানাবুদ হতে হবে কারো না কারো কাছে। কারণ এই মুখোশ পড়া সমাজে সত্য কথা বলা নয় সহজ। বর্ণচোরা আমরা। নিজের রঙ লুকাই অবিরাম। আমিত্ব প্রকাশে জুড়ি নেই আমাদের। পারলে আমরা কথার তুবড়িতে আকাশ ও মাটিকে করে দেই এক।
হাতির মাথা কেটে গণেশের ঘাড়ে কে লাগিয়েছে ? – আমি। রূপসী বাংলার স্বপ্ন কার ? – আমার। দুর্ভিক্ষ কার উপহার ? – এখানে অবশ্য আমার নয়। উত্তর হবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের। গণতন্ত্রের মানসপুত্র কে ? – আমি। সবুজ বিপ্লবের ফেরিওয়ালা কে ? – আমি, আমি এবং আমি। ঋণের ভারে দেশকে ডুবিয়েছে কে ? – বিগত দিনের স্বৈরাচরী। কজেই উত্তম পুরুষে অর্থাৎ আমি জবানীতে আমিত্ব প্রকাশ উত্তম হয় বটে। কিন্তু নিজের দোষ–ত্রুটি? ইশ্বর .. ইশ্বর .. .. ক্ষমা করো।

তো যাকে নিয়ে এখন গল্প, আগেই বলেছি সে আমার দাদী। সে ছিলো .. .. । এখন নেই। জীবনের শেষ পালকিতে চড়ে চলে গেছে আপন ঘরে। আমার দাদা তাঁকে ঘরে তুলেছিলেন তেরো বছর বয়সে। সাড়ে পনেরোতেই দু–সন্তানের জননী। ফজলু আর জোবেদার মা। উপচে পড়া সুখ সংসারে। কিন্তু সে সুখে বিষ ঢাললেন আমার দাদা। কাঁচা হলুদ বউ। আর চাঁদ– সুরুজ সন্তান রেখে দাদা পাড়ি জমালেন অসীমে, ম্যালেরিয়ার জ্বরে। চোখের জলে ভাসলেন দাদী। হৃদয়ের দুঃখ ধুলেন সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে। উঠে দাঁড়ালেন – সন্তানদের নিয়ে বাঁচার প্রত্যয়ে। একজন যুবতী বিধবা সমাজের টেরা চোখকে উপেক্ষা করে কিভাবে যে টিকেছিলো, সন্তানদের মানুষ করেছিলো আমার দাদীর মুখে শুনেছি সে কথা। পাতাল বিজয়ের মতো শিহরিত হয়েছি তা শুনে। আমি যদি বলতে চাই সে সব কথা কয়েক দিন ব্যয় করতে হবে।

(তিন)

এখন আমি যেখান থেকে গল্প শুরু করবো তখন দাদী'র বয়স পয়ষট্টি। দাদী এই বয়সে এসে হঠাৎ করে সাজ ধরেছেন কিশোরীর। শাদা থানের পরিবর্তে তিনি পড়েন রঙিন শাড়ি। নকশা করা সে শাড়ির জমিন। চুলে করেন পাটির বিণুনী। পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে যান প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি। বিষয়টা দু/একদিন মজা হিসেবে নিয়েছে সবাই। কিন্তু তিনি যখন এ কাজটা নিয়মিত শুরু করলেন মজাটা উবে গিয়ে কানাঘুষার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো ব্যাপারটা। আরেকটা বিষয় সংযুক্ত হলো এর সাথে। বাড়িতে কোন লোকজন বা মেহমান এলে দাদী শুরু করেন তার অতীত ইতিহাস বলা। লোকজন যদি একটু আহ্ উহ করে তাল মিলাতো। তবে দাদী ইতিহাস বলায় এগুতেন আরো তিন ধাঁপ।

জানো বুজি .. .. .. ফজলুর বাপ গত হইবার পর, পুরুষ মানুষের ভূমিকায় নামতে হইছিলো আমারে। স্বামী'র রাইখ্যা যাওয়া ছোটখাট ব্যবসাডারে টিকাইয়া রাখছি। ছেলেপুলেরে মানুষ করছি। পদে পদে শকুনের দৃষ্টি থাইক্যা নিজেরে বাঁচাইয়া রাখছি। এইটাই সব থাইক্যা বড় কষ্টের কাজ আছিলো। কত প্রলোভন, কত স্বপ্ন দেখাইতো আমারে। পুল–সিরাত পার করছিগো বুজি। স্বামী'র রাড়িরে আমি মসজিদের মতো পবিত্র মনে কইর‍্যা তারে ধইর‍্যা রাখছি।

আইজ আমার বাড়িঘর মাশাল্লাহ দেখার মতোন। ফজলু অনেকগুলো পাশ দিছে। কত্তো বড় চাকরী করে এখন। জোবেদার বিয়া দিছি পুরান ঢাকার নামরকরা সাজেদ সরকারের কাছে।

লোকজন বেশ আগ্রহ নিয়েই শোনে এসব। কিন্তু দাদীর এই কর্মকান্ড উত্তেজিত করে তোলে আমার মা এবং ভাই–বোনকে। তারা দাদীর এই ইতিহাস বলাকে নিজেদের ইজ্জতহানি বলে মনে করে। আমি দাদী'র প্রতি কিছুটা সহানুভুতিশীল বলে নিরপেক্ষ থাকি এ ব্যাপারে।

(চার)

সময় গড়ায়। দাদীর বিষয়টা নিয়ে আমাদের সংসারে জ্বলে হলুদ সংকেত। লাল সংকেত অপেক্ষমান থাকে একটু দুরে। তিনপক্ষ হয় আমাদের সংসার। দাদী একা একপক্ষ। আমার মা আর ভাই–বোন দাদী'র প্রতিপক্ষ। নিরপেক্ষ থেকে যাই আমি আর বাবা। আর এই পক্ষগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে আরেকটি পক্ষ। মিছিল পক্ষ। বাংলাদেশের জনগণের মতো মিছিল করে সাহস যোগায় পক্ষ, প্রতিপক্ষ এবং নিরপেক্ষ সবাইকে। কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে শুন্য।
তো আমাদের সংসারে আমার মায়ের পক্ষটি বেশ শক্তিশালী। যখন যে পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন থাকে সেই পার্টির মতো। সংসারের রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি তার হাতে। পাশাপাশি আমি বাদে সব ছেলে- মেয়েই তার পক্ষে। এই সুযোগে স্বৈরাচারী কানুন চালালেন মা দাদী'র ব্যাপারে, আমাদের ছোট সংসারে। দাদী'র জন্য বরাদ্দ বাজেটে হলো কাট–ছাঁট। খাবার–দাবার থেকে শুরু করে হাত খরচের পয়সায় বেলাতেও। দাদী'র খাবার থেকে ডিম–কলা উধাও। মাসের পানের খরচেও দাদী'র পড়ে টান। হাত- খরচা বাঁচিয়ে সখের একটা রঙিন শাড়ি আলাদাভাবে কেনা দাদী'র জন্য হয়ে পড়ে অসম্ভব প্রায়। বিদ্রোহ করেন দাদী। চিৎকার করে মুখ খোলেন। ফলাফল, সংসারে ঝগড়া। আমার মা আর দাদীর প্রতিনিয়ত ঝগড়া। ঝগড়ার সময় দাদী তার কামরার দবজা দেন বন্ধ করে। জানালা দিয়ে করেন আমার মা'য়ের কথার প্রতিউত্তর। বিপক্ষের হামলা হতে পারে – দাদী'র ভাবনায় থাকে এমনটি।

এ পরিস্থিতিতে শাখের করাত অবস্থা আমার বাবার। কোন পক্ষকেই জোরালভাবে ভাসানীর মতো অঙুলি তুলে শাসাতে পারেন না তিনি। না পারেন জাতিসংঘের মতো সংসারের যুদ্ধ বন্ধ করে রাখার কোন ভুমিকা নিতে।
দাদীকে যদি বলেন .. ..
–মা, তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে ঝগড়াঝাটি একটু বন্ধ কর। দাদী উঠেন ফুঁসে। শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরান তিনি চোখে। দাদী কান্নার অথৈ দীঘিতে শব্দ ভাসিয়ে বাবকে বলে .. .. ..
–এ কথা তোর বউকে কইতে পারস না ? যত দোষ আমার না ? থাক তুই তোর পরিবার নিয়া। যে দিকে দুই চোখ যায় হাইট্যা যামুগা।
দাদী'র কথা শুনে বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নিচু করে চলে যায় নিজ কাজে।
কখনো যদি বাবা আমার মাকে বলেন .. .. ..
– আল্লাহর দোহাই জুঁইয়ের মা, তুমি ঝগড়াঝাটি একটু ক্ষান্ত দাও। বুড়া মানুষ .. কতদিনই আর হায়াত। একটু শান্তিতে থাকতে দেও তারে।
মা ঝামটা মেরে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় অন্যদিকে। অতএব চলতেই থাকে দা–খুন্তির লড়াই সংসার। মা কখনো চিৎকার করে দাদীকে শুনিয়ে বলে .. ..
–যতদিন এই বুড়ির মরন না হয় ততদিন আর শান্তি নাই সংসারে।
দাদীও বা কম যাবে কেন ! সেও পাল্টা হুংকার দিয়ে বলে .. .. ..
–আমি মরলে তোর শান্তি.. .. না? তা অইবো না। আমি মইর‍্যা গেলেও তোর পিছু পিছু হাঁটুম। খড়ম পায় খট খট কইর‍্যা।
মা ওঠেন আরো ক্ষেপে। মার মার কাট কাট করে এগিয়ে যান দাদীর দিকে। রণাঙ্গনে আহত – নিহত নিরুপিত হয়না এর পরেও।

(পাঁচ)

এবার আমার মা শুরু করলেন নতুন পলিসি। গোয়বলসের মতোন রটিয়ে দেন দাদীর মাথা খারাপ। আধা পাগল এখন। পুরো পাগল হতে হয়তো অল্প সময় বাকী। দাদী'র কথাবার্তা আর কিশোরীর মতোন সাজগোজ পাগল হওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসেবে খেটে যায় একশো ভাগ। লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করে, দাদী পাগল। আমার বাবাও ধীরে ধীরে সেই পথ অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু এই আমি কেন জানি দাদীকে পাগল ভাবতে পারিনা। মনে হয় দাদীর পুরো বিষয়টাতে কোথায় যেন আছে একটা রহস্য। অবশ্য সেই রহস্যের গুরুতত্ব একদিন জেনেছি বটে অনেক পরে। মনোবিজ্ঞান আর মনোচিকিৎসক ফ্রয়ডকে পড়তে গিয়ে। "একজন মানুষ যদি বঞ্চিত হয় বা হারায় কোন সুখস্বপ্ন- স্বাদ আহলাদ তার জীবন থেকে তবে কখনো পুনঃসুযোগ এলে সে পূরণ করে নিতে চেষ্টায় থাকে সেই অতৃপ্তির ফাঁকটুকু- বুঝে কিংবা না বুঝে।"
আমার দাদী বিধবা হয়েছিলেন সেই কিশোরী বয়সে। নেমেছিলেন বাঁচার সংগ্রামে। জীবনের সখ- আহলাদ থেকে হয়েছিলেন বঞ্চিত। পয়ষট্টি বছর বয়সে কিশোরী বয়সের সখ হয়তো তাড়া করে ফিরছিলো তাকে অবচেতন মনে। কিন্তু আমার রহস্য উদঘাটনের এই দীর্ঘ বছর দাদী প্রতিক্ষায় থাকেননি। পাগল উপাধি নিয়ে সামান্য জ্বরেই চড়লেন শেষ পালকি।

কিন্তু অদ্ভুত ! দাদী মারা যাওয়ার পর মা'কেই দেখলাম কাঁদছেন বেশী। চার দিনে তিনি করলেন বিরাট মিলাদ। চল্লিশ দিনে দিলেন কাঙালি ভোজ। দাদী'র কবর ইট-পাথরে বাঁধালেন বাবাকে দিয়ে। স্বর্ণচাঁপার গাছ লাগালেন কবরের চারপাশে। কিন্তু আমার বোধগম্য হল না। দাদীর মৃত্যুতে মায়ের কেন এ আমুল পরিবর্তন ? এর মধ্যে কি কোন রহস্য আছে ?? থাকলে সেকি রহস্য ??? আত্ম প্রায়শ্চিত্তের ভাবনা, নাকি উৎসব আত্ম - প্রশান্তির।

গল্পটা এখানে শেষ হয়েছিলো। উত্তম পুরুষে গল্পের বর্ণনা দেয়ার খেসারত হিসেবে এই অংশটুকু জুড়ে দেয়া। পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল গল্পটি। সেই পত্রিকা হাতেই মা হাজির আমার ঘরে। চোখের পানিতে আঁচল ভিজিয়েছেন তিনি। "আমাকে নিয়ে এমন একটা গল্প লিখতে পারলি তুই? আমি কি তোর গল্পের মায়ের মতো ছিলাম কখনো? তোর দাদীও কি ছিলো এমন?" হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন আমার প্রিয় মা .. আমার বাস্তব জীবনের মা। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বোঝাতে পারলাম না সেই মুহূর্তে মাকে .. .. ..
-শুধু গল্পের খাতিরেই এ গল্প লেখা। কোন মিল নেই গল্পের সাথে তোমার। নেই দাদীরও।

কিন্তু কে বোঝাবে কাকে। গল্প লেখার ইচ্ছাটা হয়তো শেষ -মেষ মাটি চাপা দিতেই হবে।

e- mail# mschanchal@gmail.com
mschanchal@hotmail.com